শিশু অধিকার রক্ষা প্রতেকের দায়িত্ব

উম্মে ফারুয়া

“এসেছে নতুন শিশু তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান, জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত্যু আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাব আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপনে পৃথিবীর সবার জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি – নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। অবশেষে সব কাজ সেরে আমার দেহের রক্তের নতুন শিশুকে করে যাবো আর্শীবাদ তারপর হব ইতিহাস” কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টচার্যের এ অমিয় কবিতার পংক্তি আবেদন আজ যেন অনেক দূর বহুদুর, যোজন যোজন দূর। বিশ্ব শিশু দিব ও শিশু অধিকার সপ্তাহ চলতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার ৫ অক্টোবর হওয়ায় এবার ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস এবং ৫-১১ অক্টোবর শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০২০ পালন করা হবে। এ বছরে বিশ্ব শিশু দিবসের প্রতিপাদ্য হলো ‘ শিশু সাথে শিশুর তরে বিশ্ব গড়ি নতুন করে’।

শিশুরা হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনেই হোক কারণে অকারণে বিভিন্ন অনৈতিক অপরাধেও তাদের সহজেই ব্যবহার করা যায়। পরিবারে, সমাজে এমনকি রাস্তায়ও এরা নির্যাতন ও শোষণের শিকার হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে, সমাজের শক্ত অবস্থান আসীনদের দ্বারা শিশু অধিকার বেশি লঙ্ঘিত হয়। ফলে সাধারণ লোকের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া বা এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রায় ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিশুরা সবসময় দুর্বল চিত্তের অধিকারী হয়ে থাকে তাই তাদের কথা বলার সাহস থাকেনা। প্রতিবাদের ভাষা ও প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই তাদের। তারা নির্বাক তাদের কোনো অসঙ্গতি দূরে হটাবার বুদ্ধি বা ক্ষমতা থাকে না। নিরবে সয়ে যায় শত নির্যাতন।

শিশুরা জানা অজানা অনেক নির্যাতনের শিকার হয়। তবে এই নির্যাতনের খবর খুব বেশি প্রকাশিত হয় না। কারণ শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো অনেকটাই ঘটে লোক চক্ষুর আড়ালে। যার ফলে নির্যাতনের ধরন কিংবা সংবাদ থেকে যায় সবার অগোচরে। শিশুর উপর কোনো ধরনের শারীরিক বা মানসিক আঘাত, অবহেলা, দুর্ব্যবহার, আটকে রাখা, যৌন হয়রানি, অনাহারে রাখা ইত্যাদিকে শিশু নির্যাতন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো আমাদের অনেকেই বুঝতে পারেন না যে, তাঁরা নিজের অজান্তেই বিভিন্নভাবে শিশুদের নির্যাতন করে থাকেন। যিনি নির্যাতন করেন তিনিও বুঝতে পারেন না, যা করছেন তা শিশুদের নির্যাতনের আওতায় পড়ে।

শিশুর বিকাশ যদি বাধাগ্রস্ত হয়, তারা যদি তাদের পূর্ণ অধিকার নিয়ে যোগ্য নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে না পারে, তাহলে আগামী দিনের নেতৃত্ব দিতে পারবে কী-না তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যায়। শিশুর অধিকার একজন সাধারণ মানুষের সমান। মানুষের মৌলিক অধিকার- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা এই ৫টি যদি আমরা পুরোপুরিভাবে শিশুদের জন্য নিশ্চিত করতে পারি তাহলে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়তোবা খুব কঠিন হবে না। তাদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে প্রয়োজন উন্নত এবং অনুকূল পরিবেশে।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যআয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য স্থির করেছে। সেই উন্নত রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিতে হবে নতুন প্রজন্মকেই। তাই একটি শিশুকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুসারে ১৮ বছরের নীচে সকলেই শিশু হিসেবে স্বীকৃত।

বিশ্বব্যাপী শিশুর অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯২৪ সালে জেনেভায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে শিশু অধিকার ঘোষণা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৯ সালে জাতিরসংঘে ‘শিশু অধিকার সনদ’ ঘোষণা করা হয় এবং এর ৩০ বছর পর ১৯৮৯ সালে এই সনদ গৃহীত হয়। শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথম সারির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষর করে।

বাংলাদেশে শিশুর অধিকার পূরণের অভাব এবং শিশুদের নানা ঝঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ বিরাট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘনবসতি, সীমিত সম্পদ এবং ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। এ অবস্থায় সবচেয়ে শিশুরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সংসারে অভাব অনটন শিশুদের শ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য করে। এতে তাদের শিক্ষাজীবন নষ্ট হয়ে যায়। শিশুজীবনের সব রঙিন স্বপ্ন ও কল্পনা ধূসর হয়ে যায়, অপমৃত্যু ঘটে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার। বিভিন্ন কলকারখানা, খেতখামার, বাসাবাড়িতে তারা কাজ করে এবং অনেক সময় ঠিকমতো পারিশ্রমিকও পায় না। শুধু পেটভরে ভাত পেলেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রীর হাতে সামান্য অপরাধের জন্য তারা চরম নির্যাতনের শিকার হয়। এমনকি গৃহকর্মীর মৃত্যুর খবরও পাওয়া যায়। এসব ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে মেয়েকর্মীরা নানা ধরনের যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, যা তাদের শিশুমনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে মোট ৫৪টি ধারা রয়েছে। এই সনদে প্রতিটি শিশুর অত্যাচার, অবহেলা, শোষণ থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এই সনদ অনুসারে প্রতিটি শিশু নাম ও জাতীয়তা লাভের অধিকারী। প্রতিটি শিশুর রয়েছে স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত মতামত প্রকাশের ও তথ্যলাভের অধিকার। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, শরণার্থী এবং সংখ্যালঘু শিশুদের অন্যান্য শিশুদের মতো সমান অধিকার রয়েছে। প্রতিটি শিশু সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। প্রতিটি শিশু বিনামূল্যে প্রাথমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের অধিকারী। প্রতিটি শিশুর রয়েছে অপহরণ, বিক্রি বা পাচার থেকে রক্ষা পাবার অধিকার। এছাড়া অপরাধী শিশুরা মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা যে কোনো বড়ো ধরনের শাস্তি থেকে মুক্ত থাকার অধিকারী।

শিশু অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। সরকার শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় নির্বাচনি ইশতেহারে বেশকিছু অঙ্গীকার করেছে এবং সেসব বাস্তবায়নে নানাবিধ কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে সচেতন করার জন্য আরো উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। বাংলদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নীতির মৌলদর্শ বর্ণনায় শিশুর অধিকারের প্রাসঙ্গিক বিধান এবং মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ৩১ অনুচ্ছেদে সবধরনের বৈষম্য থেকে শিশুর নিরাপত্তা বিধানের সাধারণ নীতিমালার উল্লেখ রয়েছে। এসব অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান ও অভিন্ন নিরাপত্তা লাভের অধিকারী বিধায় পক্ষপাতহীনভাবে তাদের আইনের সুযোগ লাভের অধিকারও রয়েছে।

দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের শিশুদের উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সরকারিভাবে শিশুদের মানসিক বিকাশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান, যেমন শিশু একাডেমি, খেলাঘর, শাপলা-শালুক, কচি কাঁচার আসর ইত্যাদি। তাছাড়া প্রচার মাধ্যমগুলোও শিশুদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে, যেমন মিনা কার্টুন, সিসিমপুর ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠান যেমন বিনোদনধর্মী তেমনি শিক্ষামূলকও বটে। এছাড়া বেশকিছু বেসরকারি সংস্থাও গড়ে ওঠেছে ঝরেপড়া কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য অধিকার প্রদানের জন্য।

শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রণীত হয়েছে শিশু আইন ১৯৭৪। বর্তমান সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধাসমূহ দুর করে একটি সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে ঘোষণা করেছে ভিশন ২০২১। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সব শিশুকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রণয়ন করেছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ২০১০। এটি শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সুদুরপ্রসারী রূপকল্প। এছাড়াও শিশু অধিকার রক্ষায় বর্তমান সরকার প্রণয়ন করেছে পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০, জাতীয় শিশুশ্রম নীতিমালা ২০১০, বাংলাদেশ জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং শিশু অধিকার আইন ২০১৩।

শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের অর্জন ঈর্ষণীয়। এক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজির অর্জন অগ্রগণ্য। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য কেবল দক্ষিণ এশিয়াতেই নয়, সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। বলা হয় বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনের রোল মডেল। এমডিজির অনেকগুলো লক্ষ্য ছিল শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এমডিজি-২ অথার্ৎ সমতার ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রসংশনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে।

এমডিজি-৪ এ ছিল শিশুমৃত্যুহার হ্রাসকরণ। বাংলাদেশ ৭২ শতাংশ শিশু মৃত্যুর হার রোধে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য ২০১২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের এমডিজি-৪ পুরস্কার অর্জন করে। সারাদেশে ১৩ হাজার ৮৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাতৃমুত্যুহার ও শিশুমৃত্যুহার হ্রাসে কাজ করছে সরকার। এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিসরূপ ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সম্মানজনক চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ নামে পুরুস্কারে ভূষিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র মেয়াদ শেষে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘে উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সার্বজনীনভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি গ্রহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে বার্ষিক বাজেটে এসডিজিকে সম্পৃক্ত করেছে। সেখানে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

এসডিজি-২ এর আলোকে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশুর বিকাশের বাধাসমূহ ৩৬.১ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যস্থির করেছে সরকার। এসডিজি-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এর আলোকে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪১ থেকে ৩৪ এ নামিয়ে আনা হবে। এসডিজি-৪ (মানসম্পন্ন শিক্ষা) এর আলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ১০০ শতাংশ নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার বর্তমানে ৮০ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার।

শিশু অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিশুশ্রম নিরসন। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ১৭ লক্ষ শিশু শ্রমে নিয়োজিত যাদের মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ শিশু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। বর্তমান সরকার শিশুশ্রম নিরসনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গার্মেন্টস শিল্পে শিশুশ্রম শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে এদেশ থেকে সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সবধরনের শিশুশ্রম বন্ধে বদ্ধপরিকর।

সর্বোপরি প্রতিটি শিশুকেই মনে করতে হবে তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। পেশা, সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা নির্বিশেষে সমাজের সব মানুষকে প্রতিটি শিশুর প্রতি আরও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে হবে। নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের প্রতিটি নাগরিককে শিশু অধিকার রক্ষায় কাজ করে যেতে হবে। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুরক্ষিত শিশু অধিকার সম্পন্ন বাংলাদেশ নির্বিমাণে আমরা সবাই সচেষ্ট থাকবো মুজিববর্ষে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

#

২৯.০৯.২০২০ পিআইডি ফিচার